OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 44 - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা : কবিতায় নীরবতার আড়াল

দেবলীনা অধিকারী
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: debolinaadhikari95@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Partition, the Refugee, Crisis, Silences, Bengali Poetry.

Abstract

The decade of the 1940s in Bengal ended in the shadow of Partition and communal violence. The political failure and shortsightedness of national leadership led to the division of the country, leaving Bengal to suffer some of the gravest consequences of Independence. Partition resulted in a massive refugee crisis, as countless people were forced to migrate from East Pakistan to West Bengal after losing their ancestral homes, land, and livelihoods. Displacement brought not only economic hardship but also deep psychological trauma. The refugees arrived carrying memories of loss, cultural dislocation, and the humiliation of surviving in refugee camps under extremely difficult conditions.

The social, political, and economic history of Bengal during the 1950s was shaped largely by the realities of Partition and rehabilitation. Refugee colonies, unemployment, food scarcity, and political unrest became defining features of post-Partition Bengal. At the same time, the decade also witnessed the emergence of refugee movements and organized resistance, as displaced communities struggled to secure shelter, dignity, and social recognition. These movements became significant aspects of Bengal's postcolonial history.

Despite the enormity of the tragedy, Bengali poetry of the 1950s did not engage extensively with the lived experiences of Partition. While traces of grief, despair, and displacement can occasionally be found in contemporary poetry, the horrifying realities of communal riots and forced migration remained largely underrepresented. The violence that compelled people to abandon their homeland, as well as the everyday struggles of refugee existence, seldom became central themes in Bengali poetic discourse. More significantly, the collective struggles and political resistance of refugee communities were rarely portrayed in literary works of the period.

This article seeks to investigate the reasons behind such silence in Bengali poetry and literary culture. It also examines selected poems that address the experience of Partition and displacement, attempting to understand how Bengali poets represented or failed to represent — one of the most traumatic events in the history of modern Bengal.

Discussion

চল্লিশের দশক সমাপ্ত হয়েছিল দেশভাগ ও দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে। কংগ্রেসের অদূরদর্শীতা, দেশনেতাদের স্বার্থপরতার জন্য একটা গোটা দেশ ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। স্বাধীনতার পর বাংলার ভাগ্যে লেখা থাকল দেশভাগজনিত দুর্ভাগ্য, উদ্বাস্তু সমস্যা। নিজেদের ভিটে মাটি হারিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে মানুষ এপার বাংলায় আসতে বাধ্য হল। তাঁদের পুঁজি বলতে ছিল সাতকালের ভিটে ছেড়ে আসার যন্ত্রণা, নিজেদের অভ্যাস, আব্রু বিসর্জন দিয়ে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থাকার অপমান। পরবর্তী দশকের বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবটাই এই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তবে কেবল মাত্র দুঃখ হতাশাই নয় পঞ্চাশের দশক দেখেছে উদ্বাস্তু আন্দোলনও। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘশ্বাস খুব বেশি ধরা পড়েনি। যদিও সব হারানো মানুষগুলোর কান্না পঞ্চাশের দশকের কবিতায় রয়েছে, কিন্তু দাঙ্গার ভয়াবহ ছবি, তাঁদের সব ছেড়ে চলে আসার প্রকৃত কারণ বাংলা কবিতায় ধরা পড়েনি। বিশেষ করে তাঁদের লড়াই, সংগ্রামের ছবি বাংলা কবিতায় প্রায় লেখা হয়নি বললেই চলে। তার বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

অত্যাধিক দুঃখ, স্বপ্নাতীত বিভীষিকা মানুষ মনে রাখতে চায় না, এই চুপ থাকাও যেন খানিক তেমনই। কিন্তু শিল্প সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ। সেই কারণে তিরিশের ও চল্লিশের দশকের কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন, মন্বন্তরের বীভৎস ছবি ফুটে উঠেছে। তবে পঞ্চাশে দেশভাগ, দাঙ্গার বীভৎস ছবি বা উদ্বাস্তু সমস্যা কবিতায় সেভাবে আসেনি কেন? এই নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। তবে প্রথমেই কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলতে হয়।

রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা : চল্লিশের দশক আন্দোলন মুখর দশক। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও অপর দিকে বামপন্থা আন্দোলনে মুখর হয়েছে চল্লিশের দশক। কিন্তু এই দশকের শেষ থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। সমস্ত আন্দোলন স্তব্ধ করে শুরু হয় দেশভাগ নিয়ে আলোচনা। কংগ্রেস প্রথম দিকে দেশভাগের বিরুদ্ধেই কথা বলেছিল। কিন্তু মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে কলকাতা জুড়ে শুরু হয়েছিল বীভৎস ভাতৃঘাতী দাঙ্গা। এই ঘটনাই শুভ চিন্তার ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিল। গত দশকে গোষ্ঠীবদ্ধ গর্জনে সমাজ ও কবিতা কেঁপে উঠেছিল। সেই সেই প্রতিবাদ-আন্দোলনে মুখর বাংলাতেই দাঙ্গার জন্য জমি প্রস্তুত হচ্ছিল। যে দশক সাম্যবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সেই দশকই স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘটের আড়ালে দাঙ্গা এবং দেশভাগের জন্য নিজেকে তৈরি করছিল। বাংলা কবিতা কি তাঁর একটুও আঁচ পায়নি! তা কিন্তু পুরোপুর্ সত্য নয়। বিষ্ণু দে বা সমর সেনের কবিতায় তার একটা আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু সরাসরি সেই সংবাদ কবিতায় আসেনি। কিন্তু প্রতিবাদমুখর বাংলা হঠাৎই দেখেছিল তাঁদের প্রতিবাদের ক্ষেত্র দু'ভাগ হয়ে গেল! স্বাধীনতার স্বপ্নে মগ্ন থাকা রাজনৈতিক সচেতন মানুষগুলো সম্পূর্ণ বোকা হয়ে গিয়েছিল। মানুষগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশভাগ দেশত্যাগ' গ্রন্থে এমনই এক হৃদয়বিদারক বিশ্বাসঘাতকতার কথা রয়েছে, -

> "১৯২০ সালে এই মানুষটি কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সাতাশ বছর পর যেদিন স্বাধীনতা এল, মানুষটি সেদিন হাতে একটি বন্দুক নিয়ে সারা রাত জেগে বসে আছেন। বিদেশী শাসক নয়, তাঁর ভয় তখন প্রতিবেশী সম্প্রদায়কে, কারণ কয়েকদিন আগে থেকেই শোনা গিয়েছিল ওই রাতে দাঙ্গা হবে।"[১]

এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা মানুষের মনন ও চিন্তনকে অসাড় করে দেয়। দেশভাগের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও সম্ভবত এমনই ঘটনা ঘটেছিল। যে স্বপ্ন চোখে নিয়ে সুভাষ-সমর সেনরা কাব্যজগতে পা রেখেছিল দেশভাগ, দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সেই স্বপ্ন শুকিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে পঞ্চাশের দশকের কাব্য জগৎ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। কাঁটাতারে জর্জরিত কাব্যজগৎ আত্ম জিজ্ঞাসা, অবচেতন মননের দিকেই মনোনিবেশ করল। কিন্তু এই দশকের অন্যতম সমস্যা নিয়ে কবিতা প্রায় নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা প্রকৃত অর্থেই ছিলেন সর্বহারা, দেশহারা, তাঁদের ছিন্নমূলের যন্ত্রণা কবিতায় এলেও তাঁদের সংগ্রামের কথা আদৌ কবিতায় উঠে এল না। অদ্ভুত ভাবে যাঁরা সব ছেড়ে প্রকৃত অর্থে সর্বহারা তাঁদের লড়াইয়ের কথা সাম্যবাদী কবিতাতেও প্রায় রইল না। যদিও যাঁরা কমিউনিস্ট তাঁদের এই সর্বাহারাদের পাশে

দাঁড়ানো উচিত ছিল। দেশভাগের ফলে যাঁরা এপার বাংলায় এসেছিলেন তাঁরা সত্যি-সত্যিই ছিলেন সর্বহারা। কিন্তু এঁরা যদি কমিউনিস্টদের সহযোগিতা পেতেন তবে এমন করে ছিন্নমূল, অসহায় ভাবে এ দেশে ঢুকতে হত। কিন্তু দেশভাগ যেহেতু ধর্মের কারণে হয়েছিল, তাই কমিউনিস্টরা ভেবেছিলেন হিন্দু উদ্বাস্তুকে সমর্থন করলে সরাসরি সাম্প্রদায়িকতাকেই সমর্থন করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তীও তাঁর 'The marginal man' বইয়ে লিখেছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী সকলে যদি এই উদ্বাস্তুদের নেতৃত্ব দিতেন তবে এতটা অসহায় তাঁদের হতে গত না। রণদীভের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভেবেছিলেন বিপ্লব হলেই দেশভাগ অবান্তর হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন, দেশভাগ যে ঘটে গেছে এই বাস্তবতাই যাঁদের কাছে নেই, সেখানে তাঁদের কাছে বাস্তু হারার কান্না কতটা বাস্তব হতে পারে? কমিউনিস্টরা এই ছিন্নমূল মানুষগুলোর কান্না, অসহায়তাকে প্রাথমিকভাবে সাম্প্রদায়িক ছোঁয়া ভেবে সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই চল্লিশের বামপন্থী আদর্শে আদর্শিত কবির কলমেও উদ্বাস্তুদের অসহায়তা তাঁদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম কিছুই লেখা হয়নি। তা ছাড়া কংগ্রেস নেতৃত্বও স্বাধীনতার প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিলেন উদ্বাস্তুদের সকল প্রকার দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হল না। যা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায়। এই কারণেই অসহায় ভাবে ভারতে আসা মানুষ গুলোর কাছে অস্তিত্বের লড়াইয়ের চেয়ে বড় আর কিছু হল না। তাঁদের মধ্যে কারওর লেখাতেও সে ভাবে উদ্বাস্তু সংগ্রাম, তাঁদের হাহাকার প্রাথমিক ভাবে ধরা পড়ল না। এ ছাড়াও দেশভাগের প্রেক্ষাপট বর্তমান হলেও অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি সত্যি তাঁদের সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। স্বাধীন সরকার যে এভাবে তাঁর দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে তা অনেকেরই বিশ্বাসের অতীত ছিল। এই হঠাৎ ধাক্কা নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁদের কল্পনা শক্তিকে অসাড় করে তুলেছিল। তাই বাংলার এমন বিপর্যয়ের দিনে যখন সাহিত্যের তথা কবিতার পাশে দাঁড়ানোর কথা ছিল, তা আর হয়ে উঠল না। কেবল উদ্বাস্তুদের হাহাকার, কান্নার আভাস টুকুই কবিতায় ধরা পড়েছিল। তার বেশি নয়।

১. নীরবতার আড়াল : পাঞ্জাবে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে 'The other side of silence'-বই লেখার জন্য উর্বশী বুটলেয়ার মহিলাদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। তিনি তখন লক্ষ করেছিলেন সেই সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে মহিলারা মুখ খুলতে চাইছিলেন না। অনেকসময় মুখ খুললেও হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছিলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন এই সমস্ত মহিলারা সেই সবদিনের মর্মান্তিক বিভীষিকাকে ভুলতে চেয়েছিলেন। সেই হিংসা, ধর্ষণ, অত্যাচারের কাহিনী জোর করে ভুলতে না চাইলে তাঁরা বাঁচতেন কীভাবে! তিনি ইন্টারভিউয়ের শেষ উর্বশী লিখেছিলেন, -

> "Partition was difficult to forget but dangerous to remember."[২]

কবিদের ক্ষেত্রেও কি তবে একই মানসিকতা দেখা দিয়েছিল? তাই চল্লিশের সাম্যবাদী কবিদের কবিতা হোক বা পঞ্চাশ দশকের কবিদের কবিতা – সব জায়গাতেই দেশভাগ জনিত দীর্ঘশ্বাস, কান্নার প্রসঙ্গ এলেও বিভৎসতা, দাঙ্গার বাস্তব অত্যাচারকে কবিতায় আনা হয়নি। এই প্রসঙ্গে গুজরাটি লেখক কমলাবেন্ পটেল তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে দেশভাগের হিংস্রতাকে তান্ডবনৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি মনে করেছেন এই বীভৎসতা লেখার অযোগ্য। তিনি প্রশ্ন করছেন,-

> "কেন আমি লিখবো? সেই তীব্র বিবমিষাময় দিনগুলির কথা মনে করলেই মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। অনেকে মনে করে সেই স্মৃতি খুঁড়ে তোলা নিরর্থক। অনেকে আর সেই ভয়ংকর দিনগুলির মুখোমুখি হতে চায় না, পারিবারিক ক্ষত তারা ভুলে যেতে চায়।"[৩]

আর্ডেনো বলেছিলেন আউশভিটশের ঘটনার পর তা নিয়ে কবিতা লেখাই বর্বরতা। পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির অভিজ্ঞতা, আউশভিটশ-বেলজেন-ট্রেবলিংকার অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বীভৎস ঘটনায় শিল্পকর্ম অনেক সময়ই নীরব হয়ে গিয়েছে। অনেক কবি সাহিত্যিকরাই মনে করেছেন কখনও কখনও বাস্তবের নারকীয় তাণ্ডবকে কবিতায় শুদ্ধ পরিসরে স্থান না দেওয়াই উচিত। এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের দেশভাগ নিয়ে রচিত গল্প 'রক্তমণির হার' গল্পের ভূমিকা অংশের খানিকটা অংশ ধার করা যায়, -

> "কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম শতবাহু বিস্তার করে তার সময়কে গ্রহণ করে। আবার কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম শতবাহু বিস্তার করে তার সময়কে গ্রহণ করে। আবার কোনো কোনো সময়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> এমনও আসে শিল্প সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম তার দুটিমাত্র হাতকেও গুটিয়ে ফেলে তার সময়কে প্রত্যাখ্যান করে। মহত্তর নৈতিকতার গর্ভ ছাড়া শিল্প সাহিত্যের কোনো ফর্মেই কোনো জন্মস্থান নেই। এমন হতেই পারে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গায় সেই নৈতিকতা যতোটা সহজ বোধের নাগাল ছিল, দেশভাগের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত দেশভাগে ততটা নাগালে ছিল না। এমনও হতে পারে, ঐ বাস্তবকে আঁকাড়া গল্প উপন্যাসে আনলে সেই নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করা হত, কারণ দেশবাগ ও স্বাধীনতার সময় সারা ভারতের, বিশেষত পাঞ্জাব ও বাংলার মানুষকে, প্রকৃতিকে, জীবনযাপনকে ও ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল।”[৪]

ফর্ম তো স্বাধীন নয়! স্বাধীন তো শিল্পী। তাই ফর্ম শিল্পকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এখানে আসল কথা শিল্পীর নৈতিকতা। দেশভাগ, ধর্মের ভিত্তিতে নৃশংস হানাহানি কদর্যতা অবক্ষয়। এ অবক্ষয় সমাজের, রাজনীতির। কবি তো এমন অবক্ষয়ের ছবি আঁকতে পারেন না। seminar পত্রিকার ৪৬১ নম্বর সংখ্যায় জাবিদ আলমও বলেন কখনও কখনও নিস্তব্ধতা শ্রেয়। দেশ, জাতির কল্যাণে বীভৎস বাস্তবতার কথা কখনও কখনও ভুলে যাওয়া জরুরি -

> “This should be left behind, should be forgotten, so that people may live in peace, socially normal everyday life, politically as well as individually…”[৫]

এই জন্যই বাংলা কবিতায় উদ্বাস্তু মানুষগুলোর কথা, তাঁদের লড়াইয়ের কথা, দাঙ্গার মর্মান্তিক অধ্যায়টি প্রায় লেখাই হয়নি।

কবিদের কবিতায় উদ্বাস্তু স্রোতের অভিঘাত : যদিও পঞ্চাশের দশকে কবিদের কলমে দেশভাগের বিভৎসতা ধরা পড়েনি এ কথা ঠিক, কিন্তু কান্নাটুকু ধরা পড়েছিল। নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা কবিতায় রূপ পেয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাত ধরে। তাঁর ছোট্ট মেয়ে এক জবা কুসুমের তেলের শিশি ভেঙেছিল, সেই ঘটনাকে সামনে রেখেই লেখা হয়েছিল সেই বিখ্যাত কবিতা -

“তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা।” (খোকা ও খুকি)

(অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবন্ধ সমগ্র, স্বাধীনতার পূর্বাভাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ দে শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ৯.৯.৯৪, পৃ. ১৪২)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘পূব-পশ্চিম’, ‘উদ্বাস্তু’-র মতো কবিতাতে শিকড়হারানো কান্না, পুরোনো দিনের নস্ট্যালজিয়া, খন্ডিত মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ের সাক্ষী রয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘পূব-পশ্চিম’ কবিতাতে দুই বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান রয়েছে। দেশ শুধু মানচিত্র নয়, মানুষের অতীত, সংস্কৃতি, ভালোবাসা। কেবল পেনের আঁচড়ে কাগজের মানচিত্র ভাগ করা যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়, অভ্যাস, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এঁদের ভাগ করা ওত সহজ নয়। দেশ ভাগ হলে কেবল ভুগোল বদলায় না, ভেঙে টুকরো হয় মানুষগুলোর হৃদয়, তাঁদের বেঁচে থাকার রোজের অভ্যাস। সেই নিয়েই তিনি লিখছেন ‘পূর্ব-পশ্চিম’ কবিতা -

“আমাদের শত্রুও সেই এক
যারা আমাদের আস্ত মস্ত সোনার দেশকে খন্ড-খন্ড করেছে
যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে বিরূপ করে বিমুখ করে
কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে
কে রুখবে বাতাসের অবাধ স্রোত
কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের কবিতা
আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন?” (পূর্ব-পশ্চিম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

এই কবিতায় সেই সংস্কৃতির, সমাজের কথা বলা রয়েছে, যাকে বাঙালি বলা হয়। ৯ পাতার দলিল দিয়ে যাঁদের হৃদয়ে কাঁটাতার বসিয়ে দিয়েছিল র‍্যাডক্লিফ। তবে এই কবিতাও এক আশাবাদী কবিতা। যার সঙ্গে বাস্তবের মিল ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প, হানাহানি, দাঙ্গার কুৎসিত বাস্তব, নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা আদতেও অখণ্ড বাঙালিকে এক থাকতে দেয়নি। নদীর জল ও ভাবনার আকাশ দুয়েরই ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। যে বাঙালি বঙ্গভঙ্গ রুখেছিল, সেই বাঙালিই এই ভাগকে একসময় সাদরে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই উল্লাস বেশিদিন থাকেনি। ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু স্রোতের ধাক্কায় অচিরেই দেশভাগের কদর্য বাস্তবতাকে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। বাঙালি পরিচিত হয়েছিল 'উদ্বাস্তু' শব্দবন্ধনীর সঙ্গে। শিয়ালদহ স্টেশন ভরে গিয়েছিল নিজের দেশহারানো মানুষগুলোর ভিড়ে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উদ্বাস্তু কবিতায় সেই ইতিহাসের খানিক দেখা মেলে।

"আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে,
আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে,
নতুন দেশের নতুন জিনিষ-মানুষ নয়, জিনিস-
সে জিনিসের নাম কী?
নতুন জিনিসের নতুন নাম-উদ্বাস্তু।" (উদ্বাস্তু, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত)

কিন্তু তাঁরা কেবলই কাঁদেননি। দাঙ্গার বীভৎস বাস্তব, নিজ দেশ ত্যাগ করে অচেনা পথে দীর্ঘ যাত্রা তাঁদের অনেক বেশি দৃঢ় করে তোলে। আশ্রয়পার্থীর মনোভাব ঝেড়ে ফেলে তাঁরা নিজেদের জন্য লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে এই বাংলা প্রথম দেখেছিল উদ্বাস্তু মিছিল। নিজ ছেড়ে আসা মানুষগুলো উপলব্ধি করেছিল তাঁদের রাজনৈতিক শক্তিকে। রাজনৈতিক আঙিনায় 'উদ্বাস্তু' কেবল শব্দবন্ধনী হয়ে রয়ে গেলেও এঁরা আদতে রক্ত মাংসের মানুষ ছিল। যাঁরা তাঁদের সারা জীবনের পুঁজি, চেনা পরিবেশ ছেড়ে রক্তাক্ত হৃদয়ে পারি দিয়েছিল অচেনা-অজানা যাত্রায়। চেনা নারকেল সারি, পুকুর, তুলসিতলায় প্রদীপ দেওয়ার অভ্যেস সবই পেছনে পড়ে রইল। এই হৃদয়ছেঁড়া দীর্ঘশ্বাসের গল্প খানিক বোনা রয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদ্বাস্তু' কবিতায় -

"আরো দূরে ছলছলাৎ পাগলি নদীর ঢেউ
তার উপর চলেছে ভেসে পালতোলা ডিঙি ময়ূরপঙ্খি
বলছে, আমাদের ফেলে কোথায় যাবে?
আমারা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু?
এ জন্মের কেউ নই? স্বজন নই?" (উদ্বাস্তু)

এই দীর্ঘশ্বাস, ছিন্নমূলের কাহিনী বিষ্ণু দের কবিতাতেও উঠে এসেছে। অন্বিষ্ট কাব্যগ্রন্থের 'জল দাও' কবিতায় খণ্ডিত বাংলার কথা উঠে এসেছে। সেখানে দেশের খোঁজে অচেনা পথে যাত্রার কথা উঠে এসেছে, -

"এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়ি বারান্দায়
ভাবে ওরা কী যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়।" (জল দাও, বিষ্ণু দে)

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শুরু হয়েছিল দুই সম্প্রদায়ের দীর্ঘ বিপরীত মুখে পথচলা। একদলের অভিমুখ হাওড়া থেকে ঢাকা, তো আর একজন ঢাকা থেকে হাওড়া। বিষ্ণু দের এই কবিতায় রয়েছে দেশ শিকড় ছেঁড়া অসহায় যাত্রার কথা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল এই কবিতা। এই সময়ের মধ্যে বাংলার মানুষ বারবার দাঙ্গার বিভৎসতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ তাঁর মানবতা, আশা, চেনা পরিজন, চিরকালীন অভ্যাস, নিজ দেশ ত্যাগ করেছিল। যশোর, খুলনা, বরিশালের আলাদা-আলাদা সংসার, অভ্যাস, বৈচিত্র্য, আব্রু সব একাকার হয়ে গেল। তাঁদের পরিচয় রয়ে গিয়েছিল কেবল 'উদ্বাস্তু' নামক শব্দবন্ধনীর মধ্যে দিয়ে। দেশভাগের ফলে নিজভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেক সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভাগ হয়েছিল বাংলা সাহিত্য, গঙ্গা-পদ্মার জল। এপার বাংলা

ছেড়ে ওপারে চলে গেলেন সাহিত্যিক ওয়ালিউল্লাহ, শহীদুল্লাহ কায়সার। পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছিল প্রভাস লাহিড়ীর মতো অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের, ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসক কে পি ঘোষদের। তবে কেবলমাত্র সেই যাত্রাই একমাত্র বাস্তবতা ছিল না। আসল বাস্তবতা ছিল চলে আসার কারণ। অমানিত হয়ে প্রাণের দায়ে তাঁরা সব ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। সেই কুৎসিত দাঙ্গার বাস্তবতা তা থেকে উত্তরণের ছবি সাম্যবাদী কবি বিষ্ণু দের কবিতায় কোথায়! সেই দাঙ্গার ক্ষত নিজ শরীরে সারা জীবন বহন করে ছিলেন। দাঙ্গায় কবি এক পাঠান যুবককে বাঁচাতে নিজে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু কবিতাতে সেই দাঙ্গার ভয়াবহ ধরা পড়েনি। তাঁর কবিতায় উদ্বাস্তুদের লড়াই সংগ্রাম তেমন ঠাঁই পেল না। তার কারণও তিনি প্রগতির সংগঠনের কবি ছিলেন। সাম্যবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সেই সময়ের কমিউনিস্ট দলের নির্দেশিকাকেই সমর্থন করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি প্রাথমিকভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানায়। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর কবিতাতে উদ্বাস্তু সংগ্রাম, দাঙ্গার বিভৎসতা, মানুষের অসহায়তা সবটাই নীরবতার আড়ালেই আশ্রয় নিল। ঠিক যেমন সুভাষের পঞ্চাশের কবিতায় গোষ্ঠীর বদলে ধীরে ধীরে ব্যক্তি প্রাধান্য পেতে শুরু করলেও বাংলার বুক চেরা অধ্যায়গুলো না লেখাই রয়ে গিয়েছে। যদিও কবি দিনেশ দাস বা মঙ্গলাচরণের কবিতায় নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, দেশভাগের লজ্জাজনক অধ্যায় অনেক স্পষ্ট ভাবে এসেছে। দিনেশ দাসের কবিতায় রয়েছে নিজ দেশের খোঁজে অনন্ত যাত্রার ছবি,

“তবু এরা পথ হাঁটে, হেঁটে হেঁটে কতদূর যাবে
বাংলা আসাম পাঞ্জাবে
কোথায় পথের শেষ-কোন সায়াহ্নেই?” (শুভ্র ভোর, দিনেশ দাস)

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি অধিকারের দাবিতে প্রথম উদ্বাস্তু মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। সারা বাংলা হঠাৎ করে তাঁদের শক্তির সঙ্গে পরিচিত হল। রাজনৈতিক দল গুলোও সেই শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু মিছিলের কথা খুব কম কবির কবিতাতেই ধরা পড়েছিল। কিন্তু সেইদিনের সেই মিছিলের ছবি পাওয়া যায় দিনেশ দাসের ‘শেষ নেই’ কবিতায় -

“ভারত সীমান্ত পারে আমলকি আখরোট বনের কিনারে
অনেক বালির ঢিপি পার হয়ে
খর্জুর শ্রেণীর ধারে-ধারে,
কারা যায় দেল দলে অন্ধকার ঠেলে
আরবে ইজেলে নীড়হীন,
এশিয়ার নব বেদুইন।” (শেষ নেই)

দিনেশ দাসের কবিতায় আসে নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। সেই বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীনতার সুখ বিস্বাদ হয়ে গেল। কত সংঘর্ষের স্বাধীনতা পর্যবসিত হল বিশ্বাসভঙ্গের দিনে। স্বাধীন দেশের নাগরিককে ঠেলে দেওয়া হল প্রস্তুতিহীন এক সংগ্রামে দিকে। দিনেশ দাসের কবিতায় সেই সংগ্রামের কথা না থাকলেও বিশ্বাসভঙ্গের অভিমানটুকু রয়ে গিয়েছে।

“এখানে তো শাঁখের করাতে
দিনগুলি কেটে যায় করাতের দাঁতে
সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ-কালনেমী করে লঙ্কাভাগ।” (পনেরই আগস্ট, ১৯৪৭)

উদ্বাস্তু আগমনে শিয়ালদহ স্টেশন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনাথ, নারীদের ভিড়ে স্টেশনে পা রাখার জায়গা হত না। সব ছেড়ে গার্হস্থ মানুষগুলোর ঠাঁই হয়েছিল স্টেশনের আব্রুহীন ক্যাম্পে। লজ্জা, প্রাকৃতিক কাজ, জন্ম, মৃত্যুর জন্য সামান্য আড়ালটুকুও তাঁরা পায়নি। প্রাণের দায়ে দেশ ছেড়েছিল তাঁরা অচেনা জায়গায় ভিটে মাটি হীন মানুষগুলো প্রতিদিন অভ্যাস, যাপন হারানোর কষ্টে, অপমানে অপমানিত হয়েছিলেন। মঙ্গলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দন ধরা রয়েছে, -

“এস দেখে যাও কুটি কুটি সংসার
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছাড়ানো বে-আব্রু সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও-যে
ছেঁড়া কানিটুকু কোমরজড়ানো আদুরি, ঘরের বউ-
আমার বাঙলা।" (এস দেখে যাও)

চল্লিশের দশকের তেলেঙ্গানা, তেভাগা আন্দোলনের কাহিনী তাঁর কলমেই স্থান পেয়েছিল। কিন্তু মানবতার এমন অপমানের দিনে রাম বসুর কলমে খুব একটা কিছু রইল না। দেশ হারানো মানুষগুলোর যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাস তাঁর কবিতায় খুব একটা ধরা পড়েনি। তবে 'জনান্তিক' কবিতায় দাঙ্গার বীভৎসতার একটা আভাস পাওয়া যায়, -

"অথচ হঠাৎ শোন স্তব্ধতায় হত্যার চিৎকার
কী লজ্জার কথা এই, এই এক নিষ্ঠুর ধিক্কার।" (যখন যন্ত্রণা, জনান্তিক, রাম বসু)

দেশভাগের পর কত মেয়ের সংসার ভেঙে গিয়েছে। মায়া-মায়া সন্ধ্যা প্রদীপের দিন চলে গিয়েছে। তাঁর বদলে তাঁরা মুখোমুখি হয়েছে কঠোর বাস্তবতার। উদ্বাস্তু নামের সঙ্গেই তাঁদের ঘুঁচেছে আব্রু, লজ্জা, অন্দর-বাহিরের আড়াল। রাম বসুর কবিতায় উঠে এসেছিল এমনই সংসার ভাঙার কষ্ট, -

"কোথাও কোথাও বৌ কোথায় সে মহিম মরদ
অন্ধকার থাবা তুলে, ফুলে' ফুলে' গর্জায় গাছ
মাটি টলে ওঠে রাগে, কাশ নল চক্র মেলে ধরে
পাড়ায় পাড়ায় ছোটে বাউন্ডুলে বাতাসের গলা;
এমনি করেই কেন তছনছ হয়ে যাবে সব
এমনি করেই কেন মুছে যাবে সংসারের সাধ?" (সোহাগীর সংসার)

কিন্তু বাস্তব এটাই এত বড় মানবতার বিপর্যয়ে যতটা লেখা উচিত ছিল ঠিক ততটা লেখা হয়নি। তাঁদের লড়াইয়ের কথা, অপমানের কথা কবিতায় উঠে আসেনি। তাঁর অন্যতম কারণ কমিউনিস্ট দলের ভূমিকা তাই চল্লিসের সাম্যবাদী কবি, যাঁরা লড়াইয়ের সংগ্রামের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাঁরাও এত বড় বিপর্যয়ে প্রায় চুপ রইলেন। কমিউনিস্ট যদি এই উদ্বাস্তুদের নেতৃত্ব দিতেন তবে সম্ভবত, তাঁরা এতটা অপ্রস্তুত, অসহায় হয়ে এ দেশে আসতেন না। কিন্তু কমিউনিস্ট দলের কেউ সেই কাজ করলেন না। সাম্যবাদী কবিরাও তাঁদের থেকে অদ্ভুত দূরত্ব বজায় রাখলেন। দেশভাগের কারণ যেহেতু পুরোপুরি ধর্মীয়। তাই সাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরে থাকার জন্যই সম্ভবত এমন নীরবতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। একমাত্র পঞ্চাশের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উদ্বাস্তু সমস্যা, তাঁদের হাহাকারের কথা স্থান পেয়েছে। কেবল হারানোর কথা নয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রীতিমতো প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিসেন তিনি। 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে' কবিতায় মানচিত্র সর্বস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

"তুমি মাটি? কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আর-কিছু নও?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপি চুপি-
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্যসহচর! তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি।" (স্বদেশ স্বদেশ করিস কাকে, যমুনাবতী)

তিনি এই কবিতায় দেশছাড়ার হাহাকার তুলে ধরেছেন। আজন্ম লালিত অভ্যাস, যাপন ছেড়ে যাওয়া যে কষ্ট তা তাঁর মতো করে এত ভালভাবে কোনও কবি লিখে যাননি। তিনি এখানে কেবল হাহাকারের কথা লেখেননি। রাষ্ট্রব্যবস্থা, দেশনেতাদের প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন দেশ কোনও মানচিত্রের কাগজ নয়। দেশ মানে অভ্যাস, দেশ মানে চেনা যাপন। তাকে কয়েকজন মিলে ভাগ করে দেওয়া যায় না। দেশনেতারা এই সামান্য সত্যটুকু দেখতে পাননি। বেশ কিছু বছর পর শঙ্খ ঘোষ লিখছেন রাঙামামিমার গৃহত্যাগ -

"ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপরে সাঁকো পেরিয়ে-
ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!" (রাঙামামিমার গৃহত্যাগ, নিহিত পাতালছায়া)

এই রাঙামামিমাদের ঘিরে অনেক ব্যাপক মায়া জড়ানো থাকত। কিন্তু এঁদেরই হঠাৎ করে দেশ ছাড়া হতে হল। তাঁরা অজানা পথে পা বাড়াল। তাঁদের দেশত্যাগের নিদান দেওয়া হল, কিন্তু আজন্মের সংস্কার, চেনা পথঘাট, গোয়ালের গরু সবকে কি ভাবে ছাড়া সম্ভব ছিল। উদ্বাস্তু নামক শব্দবন্ধনীর মাঝে এই হারানো গুলোও মিশে গেল। এমনই এক নারীর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়, -

> "তখন নিঃশব্দে এবং গোপনে গ্রামবাসী, অন্যান্য হিন্দু পরিবার সীমান্তের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছিল। পাশের বাড়ির লোকেরাও অনেক সময় জানতে পারেনি যে, শয়ে শয়ে বছর ধরে যারা প্রতিবেশী এবং আত্মীয়, পরদিন ভোরে উঠে তাদের ভিটে শূণ্য দেখবে। ...আমরা যেদিন চলে আসি সেদিনটার কথাও আমার মনে আছে। মা-বাবা এবং জ্যাঠামশাই-জেঠিমা আমার থেকেও বয়সে যারা ছোট তাদের নিয়ে দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা বারো-তেরোজন কলকাতার পথে রওনা হয়েছিলাম। বৈঠকখানার ঘরটা পেরোবার আগে পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়ার উত্তেজনায় অন্য কিছু খেয়াল হয়নি। ঘরটা-আধাআধি পেরোবার পর টের পেয়েছিলাম যে, আর হাঁটতে পারছিলাম না...।"[৬]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতাতেও এই ভাঙা বাংলার অশ্রুকাতর মুখের ছবি এসেছে। রাঙামামীদের তাঁর 'ধাত্রী' কবিতায় তিনি উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গকে তাঁর ধাইমার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাঁর অসহায়তার কথা লিখেছিলেন, -

"শিয়ালদার ফুটপাতে বসে আছেন আমার ধাইমা
দুটো হাতে সামনে পেতে রাখা,
ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে।
যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজি পেঁজি বাহাত্তুরে রিফিউজি বুড়ি।" (ধাত্রী)

এছাড়া তাঁর 'জনমদুখিনী', 'দুঁখের গল্প', 'ফিরে যাবো' প্রভৃতি কবিতাতেও সেই ফেলে আসা মনকেমনের গল্প আছে।

কিন্তু শেষ অবধি বলতে হয় এই দেশভাগ নিয়ে যত বেশি কবিতা লেখার কথা ছিল, তত বেশি লেখা হয়নি। দাঙ্গার বীভৎসতা নিয়ে প্রায় কোনও কবিতাই লেখা হয়নি। পাঞ্জাবে দাঙ্গার বীভৎসতা নিয়ে যত সাহিত্য রচনা হয়েছিল বাংলাতে তাঁর শিকিভাগও হয়নি। পরে এই দেশভাগ নিয়ে কিছুটা আলোচনা হলেও চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকের কবিদের কলমে দাঙ্গার বাস্তবতা প্রায় দেখাই যায় না। কমিউনিস্ট পার্টির বাধ্যবাধকতা, শিল্পের শুদ্ধ হওয়ার দায়ের জন্য দাঙ্গার বীভৎসতা নিয়ে লেখা হয়নি-এই যুক্তি যদিও বোধগম্য। কিন্তু তাঁদের লড়াইয়ের কথাও কারওর কবিতায় তেমন করে ধরা পড়ল না কেন! এ সত্যি রহস্যের। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের লড়াই নিয়ে অসংখ্য শিল্প রচনা করা যেত, কিন্তু তা ঘটল না। এ ক্ষতি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ; দেশভাগ দেশত্যাগ; অনুষ্টুপ প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪; ২ই নবীন কুণ্ডু লেন; কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৪
২. সিকদার, অশ্রুকুমার; ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য; সাহিত্য লোক; প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০; ৩২/৭ বি ডন স্ট্রীট; কলিকাতা ৭০০ ০০৬, পৃ. ২২
৩. সিকদার, অশ্রুকুমার; ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য; সাহিত্য লোক; প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০; ৩২/৭ বি ডন স্ট্রীট; কলিকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ২৩
৪. সিকদার, অশ্রুকুমার; ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য; সাহিত্য লোক; প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০; ৩২/৭ বি ডন স্ট্রীট; কলিকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১৮

৫. সিকদার, অশ্রুকুমার; ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য; সাহিত্য লোক; প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০; ৩২/৭ বি ডন স্ট্রীট; কলিকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৫৯
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ; দেশভাগ দেশত্যাগ; অনুষ্টুপ প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪; ২ই নবীন কুণ্ডু লেন; কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৭৬

Bibliography:

অশ্রুকুমার সিকদার; ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য; প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, সাহিত্য লোক, ৩২/৭ বি ডন স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭০০০০৬
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেশভাগ দেশত্যাগ; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, অনুষ্টুপ প্রকাশনী; ২ই নবীন কুণ্ডু লেন; কলকাতা ৭০০০০৯
শঙ্খ ঘোষ; শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ; প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৬৭, দেজ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০০৭৩
অমিতাভ দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৬; দেজ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০০৭৩
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ; প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১২; দেজ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০০৭৩
দিনেশ দাস; দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র; প্রথম প্রকাশ ১৫ই অগস্ট ১৯৮৪; মনীষা; ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৭৩

সহায়ক গ্রন্থ :

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; আধুনিক কবিতার ইতিহাস; প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৭, দেজ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০০৭৩
সেদিনের কথা; মণিকুন্তলা সেন; প্রথম প্রকাশ ২৩ শ্রাবণ, ১৩৫৯; প্রথম প্রকাশ; নবপত্র প্রকাশনা; ৮ পটুয়াটোলা লেন; কলকাতা ৭০০০০৯
শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; উদ্বাস্তু; প্রথম প্রকাশ অগস্ট ১৯৬০; সাহিত্য সংসদ ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

পত্র-পত্রিকা :

অনিল আচার্য; অনুষ্টুপ শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা; সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক অষ্টবিংশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৪; ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০১